سورة العلق

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ
يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١ اَوْ اَمَرَ
بِالتَّقْوٰى ۝١٢ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝١٤ كَلَّا لَئِنْ
لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝١٧
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا ۗ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝١٩ ع

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) অথবা আল্লাহ্‌ভীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই---(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্‌বান করুক। (১৮) আমিও আহ্‌বান করব জাহান্নামের

প্রহরীদেরকে। (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(اقْرَأْ থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের মাধ্যমে নবুয়তের সূচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নবুয়ত লাভের কিছু দিন পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাআপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিগুহায় গমন করে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাৎ জিবরাঈল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : اقْرَأْ অর্থাৎ পাঠ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : مَا انا بقارى অর্থাৎ আমি যে পড়তে জানি না। জিবরাঈল তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন : اقْرَأْ পাঠ করুন। তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন। এমনিভাবে তিন বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন : اقرا থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত)

হে পয়গম্বর (এ সময়কার আয়াতগুলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [অর্থাৎ যখন পাঠ করেন, তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক আয়াতে اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ বলে কোরআন পাঠের সাথে আউযুবিল্লাহ্ পড়ার আদেশ করা হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা মনে মনে বলা ওয়াজিব এবং মুখে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিসমিল্লাহ্ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে এ সূরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বর্ণিত আছে।

اخرجه الواحدى عن عكرمة والحسن انهما قالا اول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم واول سورة اقرأ واخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس انه قال اول ما نزل جبرائيل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم - كذا فى روح المعانى -

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে স্বয়ং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি শুন। এতে স্বয়ং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বক্তার উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করুন অথবা পরে যেসব আয়াত নাযিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবগুলোর পাঠই আল্লাহ্‌র নামে হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে পেরে-ছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভীতির কারণে তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল মানসিক শান্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরম্ভ করার সময় বলেন ঃ পড়। একে কেউ অসাধ্য কাজের আদেশ বলে না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওযর করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা পয়গম্বরের শানের খেলাফ হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় লিখিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহৃত নয়। তাঁর যেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই এই ওযর করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্ভবত জিবরাঈল তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। والله اعلم পালনকর্তা (رب) শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষভাবে এ গুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাগ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া সৃষ্টিকর্ম স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য কাজ। ব্যাপক সৃষ্টির কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে---) যিনি (সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে) মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিরূপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উন্নত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোকর ও যিকর করা উচিত। বিশেষভাবে জমাট রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা একটা বরযখী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বীর্য, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিণ্ড, অস্থি গঠন ও আত্মাদান। সুতরাং জমাট রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা-সমূহের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত করার জন্য বলা হয়েছে ঃ) আপনি কোরআন পাঠ করুন। (অর্থাৎ প্রথম আদেশ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহ্‌র নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলীগের উপায় এবং পয়গম্বরের

আসল কাজই তবলীগ। সুতরাং এই পুনরুল্লেখ দ্বারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর সে ওযর দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাঈলের কাছে পেশ করেছিলেন যে, তিনি পড়া জানেন না ঃ বলা হয়েছে ঃ) আপনার পালনকর্তা দয়ালু (যা ইচ্ছা দান করেন) যিনি (লেখাপড়া জানাদেরকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (এবং সাধারণভাবে) মানুষকে (অন্যান্য উপায়ে) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। [অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয় ---অন্যান উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত উপায়াদি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল নয়---প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি। সুতরাং আপনি লেখা না জানলেও আমি অন্য উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওহীর জ্ঞান সংরক্ষণের শক্তি দান করব। কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ দিয়েছি। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। সুতরাং এ আয়াতসমূহে নবুয়ত ও তার ভূমিকা এবং পরিপূরক বিষয়াদির বর্ণনা হয়ে গেছে। যেহেতু পয়গম্বরের বিরোধিতা চরম গোনাহ্ ও গর্হিত কাজ, তাই অনেক পরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশিষ্ট্য বিরোধিতাকারী আবূ জাহ্লের নিন্দা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য বিরোধিতা-কারীও এতে শামিল হয়ে গেছে। এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবূ জাহ্ল রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায পড়তে দেখে বলল ঃ আমি আপনাকে নামায পড়তে বারবার নিষেধ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলে সে বলল ঃ মক্কার অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রয়েছে। যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাড়ে পা রেখে দেব (নাউযুবিল্লাহ্)। সেমতে সে একবার নামায পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্তু হুযূর (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সরতে লাগল। পরে এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলল ঃ আমি সামনে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিষ্ট কিছু বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বলেন ঃ তারা ছিল ফেরেশতা। যদি আবূ জাহ্ল আরও সামনে এগোত, তবে ফেরেশ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে] সত্যি সত্যি (কাফির) মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ, সে নিজেকে (অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী মনে করে। (অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ — الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا ---অথচ এই অমুখাপেক্ষিতার কারণে অবাধ্যতা করা নির্বু-দ্ধিতা। কেননা, কেউ যদি সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু স্রষ্টার প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এমনকি পরিশেষে হে মানুষ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে। (কখনও জীবদ্দশার ন্যায় তাঁর কুদরত দ্বারা বেষ্টিত হবে এবং তখন অবাধ্যতার যে শাস্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পালাতে পারবে না। সুতরাং অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতএব নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং তজ্জন্য অবাধ্যতা করা বোকামিই বটে। অতঃপর জিজ্ঞাসার আকারে অবাধ্যতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে---) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে (আমার) এক বান্দাকে নামায পড়তে বারণ করে? (অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই। নামাযীকে নামায পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিস্ময়কর বিষয়। অতঃপর অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে বান্দা (যাকে বারণ করা হয়েছে) সৎ পথে থাকে (যা নিজস্ব গুণ) অথবা অপরকে আল্লাহ্ভীতি শিক্ষা দেয় (যা পরোপকার। 'অথবা' বলে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দু'টি গুণের মধ্যে একটি থাকলেও নিষেধকারীর নিন্দার জন্য যথেষ্ট হত। আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে)। হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে (নিষেধকারী) বান্দা মিথ্যারোপ করে এবং (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে। প্রথমে দেখ যে, নামায পড়তে বারণ করা কত মন্দ! এরপর লক্ষ্য কর, বারণকারী একজন পথভ্রষ্ট এবং যাকে বারণ করছে সে একজন সৎ পথপ্রাপ্ত। সুতরাং এটা কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার! অতঃপর বারণকারীর উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে---) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তার অবাধ্যতা এবং তা থেকে উৎপন্ন কার্যকলাপ) দেখছেন (এর জন্য) তিনি শাস্তি দেবেন? (তার কখনও এরূপ করা উচিত নয়।) যদি সে (এই কর্মকাণ্ড থেকে) বিরত না হয়, তবে আমি (তাকে) মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে যা, মিথ্যা ও পাপে আপ্লুত কেশগুচ্ছ (জাহান্নামের দিকে) হেঁচড়াবই। (সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গম্বরকে হুমকি দেয়---) অতএব সে তার সভাসদ-দেরকে আহ্বান করুক, (সে এরূপ করলে) আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব। [সে আহ্বান করেনি বলে আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাগণকে আহবান করেন নি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আবূ জাহ্ল এরূপ করলে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতা-গণ অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করত]। কখনও তার এরূপ করা উচিত নয়। আপনি (এই নালায়েকের কোন পরওয়া করবেন না এবং) তার কথা মেনে চলবেন না (যেমন এ পর্যন্ত মেনে চলেন নি) এবং (পূর্ববৎ) সিজদা করুন এবং আমার নৈকট্য অর্জন করুন। [এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাস্সিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে---এই বিরতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আ) সামনে আসেন

এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সি-রের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।---(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মত সামনে এসে যেত।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালুন্নূর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার -পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেলে তিনি পত্নী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনিভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমযান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র) বলেন ঃ এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামায ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেন ঃ তিনি নূহ্, ইবরাহীম ও ঈসা (আ)-র শরীয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।---(মাযহারী)

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করে বললেন ঃ اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। তিনি বলেন ঃ

ما انا بقارى আমি পড়া জানি না। [কারণ, তিনি উম্মী ছিলেন। জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হন নি। তাই ওযর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার এ জওয়াব শুনে জিবরাঈল (আ) আমাকে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জওয়াব দিলাম। এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মত পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জওয়াব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে পৌঁছে বললেন ঃ زملونى زملونى আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদীজা (রা) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হল। এ ভাবান্তর ও কম্পন জিবরাঈল (আ)-এর ভয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক ঊর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন ঃ এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা) বললেন ঃ না, এরূপ কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদুষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসমানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত চরিত্র-গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনও বঞ্চিত ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াত যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিব্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিব্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইঞ্জীল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন ঃ ভাইজান, আপনি

তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকার জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। শোনামাত্রই ওয়ারাকা বলে উঠলেন ঃ ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে ? ওয়ারাকা বললেন ঃ অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়।---(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে।---(মাযহারী)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ---এখানে اسم-শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহ্র নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী ; লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।---(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্র 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خلق-ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ---পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ ; علق-শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা

হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ—এখানে اقْرَأْ-আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পাঠ করার জন্য প্রথম اقْرَأْ-বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اقْرَأْ তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। اكرم বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্ট-জগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ—মানব সৃষ্টির পর মানব শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اقرأ—শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এক রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى غلبت غضبى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة فهو عنده فى الذكر فوق عرشه -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

কলম তিন প্রকার ঃ আলিমগণ বলেন ঃ জগতে তিনটি কলম আছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতাগণের কলম, যদ্দ্বারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমাণ এবং মানুষের

আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিন. সাধারণ মানুষের কলম, যদ্দ্বারা তারা তাদের কথা-বার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ।---(কুরতুবী) তফসীরবিদ মুজাহিদ আবূ আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই ঃ কলম, আরশ, জান্নাতে আদন ও আদম (আ)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় ঃ কেউ কেউ বলেন—সর্বপ্রথম এই জ্ঞান মানবপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।--- (কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ)-ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।----(যাহ্হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহ্র বড় নিয়ামত ঃ হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, কলম আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়-সমূহের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাব-তীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী (সা)-র মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জ্ঞান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ

কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফল্গুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মো'জেযাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।----(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ----পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত---শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে---আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানত না) বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ, শিক্ষা স্বভাবত অজানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না; যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে : اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ তা'আলারই দান।---(মাযহারী) কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ) অথবা রসূলে করীম (সা)। হযরত আদমকেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে : وعلم ادم الاسماء كلها —এবং নবী করীম (সা)-ই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে :

ومن علومك علم اللوح والقلم ।

সূরা ইকরার উপরোক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াত-সমূহ আবূ জাহ্লের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবূ জাহ্লের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাযের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى —আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহ্লকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনা-ঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবূ জাহ্লের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম (সা)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল।

পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ---অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রজ্ঞাবলে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি করার মধ্যেই সন্তুষ্টি দান করেছেন এবং কাউকে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহ্র কুদরত ও প্রজ্ঞার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ---এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহ্ল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও সিজদা করলে সে তাঁর ঘাড়

পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ —অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ —سفع-এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। ناصية শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ —এতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবূ জাহ্লের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সিজদায় দোয়া কবূল হয় ঃ আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء অর্থাৎ বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

فانه قمن ان يستجاب لكم —অর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামাযসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন।
